প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

মুরগি পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি)

উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ
Training on Improved/Modern Livestock Technology Management and Practice

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ ওও প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ): প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
উপজেলা ঃ ---------- জেলা ঃ ----------

প্রশিক্ষণ শিরোনাম ঃ মুরগি পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) খামারী/কৃষক সদস্যদের উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার (CIG Farmers Training on Improved / Modern Livestock Technology Management and Practice).

প্রশিক্ষণের মেয়াদ ঃ ১ দিন।
প্রশিক্ষণের তারিখ ঃ -----/-----/------
প্রশিক্ষণের স্থান ঃ -----------------
অংশগ্রহণকারী ঃ (সিআইজি এর নাম) মুরগি পালন সিআইজি খামারী/কৃষক
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ ৩০ জন

প্রশিক্ষণ সূচী

সেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী
১ম সেশন	০৮.৩০ – ০৯.০০	প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)
	০৯.০০ – ০৯.৩০	প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)
	০৯.৩০ – ১০.৩০	মুরগির উন্নত জাত নির্বাচন, বাসস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক/উন্নত টেকসই প্রযুক্তি	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
২য় সেশন	১০.৩০ – ১১.০০	চা- বিরতি	
	১১.০০ – ১২.০০	দেশী মুরগি পালন কৌশল ও দেশী মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
৩য় সেশন	১২.০০ – ১৩.০০	লেয়ার মুরগির ডিমপাড়া বাক্স, ডিম সংগ্রহ, ডিম বাছাই ও গ্রেডিং; মুরগীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
	১৩.০০ – ১৪.০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন বিরতি	
৪র্থ সেশন	১৪.০০ – ১৫.০০	বায়োসিকিউরিটি বা জীবনিরাপত্তা ও মুরগির টিকা প্রদান কর্মসূচী	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
৫ম সেশন	১৫.০০ – ১৬.০০	সিআইজি সদস্যদের কার্যক্রম; পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
	১৬.০০ – ১৬.৩০	চা - বিরতি	
	১৬.৩০ – ১৭.০০	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)

অধিবেশন পরিকল্পনা

প্রশিক্ষণ শিরোনাম ঃ মুরগি পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) খামারী/কৃষক সদস্যদের উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার (CIG Farmers Training on Improved / Modern Livestock Technology Management and Practice).

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ঃ

- মুরগি পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে সিআইজি সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
- মুরগি খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রত্যাশা ঃ

- প্রশিক্ষণের ফলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষক/খামারীদের দক্ষতা ব্যবধান কমবে।
- কৃষক/খামারীগন এর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁরা নিজেরাই খামারের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে।
- কৃষক/খামারীগন প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞান নিজ খামারে বাস্তবায়ন করে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে এবং এ বিষয়ে নন-সিআইজি কৃষক/খামারীগণকে পরামর্শ দিতে পারবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন ঃ

এনএটিপি-২ এর আওতায় নতুন উপজেলাগুলোতে প্রতি ইউনিয়নে ০৩টি করে সিআইজি এবং প্রতি সিআইজিতে ৩০জন খামারী/কৃষক সদস্য রয়েছে। যে কোন একটি সিআইজি-এর এই ৩০ জন সদস্যকে একত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা সুনির্দিষ্ট ফরমে নিজেদের নাম নিবন্ধন করবেন। এ জন্য প্রশিক্ষণ শুরুর আগে প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer) নাম নিবন্ধন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণের জন্য অভীষ্ট দল ঃ ৩০ জন সিআইজি খামারী/কৃষক সদস্য।

নাম নিবন্ধন এর লক্ষ্য ঃ

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করা যাতে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচিতি ঘটে এবং কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ

ব্যানার, নিবন্ধন ফরম, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন ঃ

- প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুর আগে সকল প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহন।
- প্রশিক্ষণ সংগঠক/ইউএলও উদ্বোধন অনুষ্ঠান এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
- সভাপতির অনুমোতিক্রমে যথানিয়মে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুকরণ।

কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ সংগঠক যা আলোচনা করবেন ঃ

১. প্রশিক্ষণ শুরু করার সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক উপস্থিত অংশগহণকারীদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের জন্য আহ্বান জনাবেন। এ পর্যায়ে সিআইজি সদস্যগণ নিজের নাম ও কোন গ্রামে থেকে এসেছেন জানিয়ে পরিচিত হবেন।

২. পরিচিতি পর্ব শেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক তাঁর স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। তিনি বক্তব্য প্রদানের সময় সংক্ষিপ্তভাবে এনএটিপি-২ সর্ম্পকে সকলকে অবহিত করবেন।

   ➢ বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক, ইফাদ ও ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে দেশের ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলায় ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টে কনোলজি প্রোগ্রাম - ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
   ➢ এনএটিপি-২ এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে - প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারী/কৃষকদের খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উপাদিত পণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তিতে বাজারে প্রবেশাধিকারে তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
   ➢ উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ পরিচালনায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
   ➢ এ জন্য প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের নির্মীত ভবনে দুইটি কক্ষ নিয়ে FIAC গঠন করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে FIAC সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এর CEAL-কে উপস্থিত সিআইজি সদস্যগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তি করণ ঃ

- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে এক জনকে এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে এক জনকে বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।
- সিআইজি সদস্যদেরকে অত্র প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান ও প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে খামারের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ পূর্বক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তিকরণ।

১ম সেশন ঃ

মুরগির উন্নত জাত নির্বাচন, বাসস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক/উন্নত টেকসই প্রযুক্তি সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

মুরগির উন্নত জাত নির্বাচন

দেশী জাতের মুরগিঃ

- বাড়িতে ছাড়া অবস্থায় যে সমস্ত মুরগি চড়ে বেড়ায় তারা দেশী জাতের মুরগি। এরা বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাদ্য কুড়িয়ে খায়।
- দেশী জাতের মুরগি ছাড়া অবস্থায় পালন করতে হয় বলে এদের পালন খরচ নেই বল্লেই চলে।
- এদের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। এরা ওজনে বেশ হাল্কা।
- এরা ডিমে তা দেয় এবং বাচ্চা পালন করতে খুব পারদর্শী।
- এরা আকারে ছোট হয় এবং খুব চঞ্চল ও চালাক। সহজে বন্য প্রাণি এদেরকে ধরতে পারে না।
- দেশী মুরগির মৃত্যু হার বাচ্চা বয়সে অধিক এবং অপুষ্টিজনিত কারণে উৎপাদন আশানুরূপ নয়।

- বাচ্চা বয়সে দেশী মোরগ মুরগির মৃত্যুহার কমিয়ে এনে এবং সামান্য সম্পূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করলে দেশী মুরগি থেকে অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদন করা সম্ভব। এজন্য দেশী মুরগিকে যত্ন নিতে হবে।
  - দেশী মুরগিকে নিয়মিত রাণীক্ষেত ও বসন্তের প্রতিষেধক(টিকা) প্রদান, কৃমিনাশক চিকিৎসা এবং বন্য জন্তুর কবল থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
  - বাচ্চার মৃত্যুর হার কমিয়ে আন্তে হবে।
  - মুরগির দৈহিক ওজন ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সম্পুরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

মুরগির উন্নত জাত ঃ

রোড আইল্যান্ড রেড (আর,আই,আর)ঃ

- এ জাতের মোরগ ২-৩ কেজি এবং মুরগি ১.৫-২ কেজি পর্যন্ত ওজনের হয়
- এদের ডিম উৎপাদনের হার মোটামুটি ভাল। ডিমের রং বাদামী।
- বর্তমানে উন্নত দেশে বাদামী রঙের ডিম উৎপাদনে বাণিজ্যিক হাইব্রিড জাত সৃষ্টির জন্য এ মুরগি ব্যবহার করা হয়। এরা আমাদের দেশে বছরে ১৫০-২০০ ডিম দিয়ে থাকে।

হোয়াইট লেগহর্নঃ

- ডিম উৎপাদনকারী জাত হিসেবে পৃথিবীর সব দেশেই খুব জনপ্রিয়।
- ধবধবে সাদা পালক দিয়ে সারা শরীর ঢাকা। কানের লতি ও ঝুটি উভয়ই লাল।
- ডিমের আকার বেশ বড়।
- বছরে প্রায় ৩০০টি ডিম দেয়।
- আমাদের দেশের বিভিন্ন পোল্ট্রি খামারে ব্যাপক পালন করা হচ্ছে।

ফাওমি ঃ

- এরা আকারে প্রায় দেশী মুরগির মত।
- মোরগ ওজনে ১.৫-২ কেজি এবং মুরগী ১-১.৫ কেজি পর্যন্ত হয়।
- ফাওমি মুরগি মূলত মিশরের জাত। এদেশে পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হয়েছিল।
- এদের গলার দিকে ধূসর কিন্তু সমস্ত শরীরে সাদা কালো রংয়ের মিশ্রণ।
- এদের কানের লতি সাদা। মাথার ঝুঁটি আকরে ছোট, বেজোড় এবং লাল।
- এরা দেশী জাতের মুরগিরমত খুব চঞ্চল ও চালাক।
- দেশী মুরগিরমত এদের ছাড়া অবস্থায় পালন করা যায়।

সোনালী সংকর জাত ঃ

- আর,আই,আর মোরগ ও ফাওমি মুরগির সংকরায়ণে সোনালী সংকর জাত সৃষ্টি হয়
- এরা আকারে দেশী মুরগির চেয়ে একটু বড়
- ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের বাজারে বর্তমানে সোনালী জাতের মুরগির চাহিদা অনেক বেশী
- প্রাপ্ত বয়স্ক মোরগের ওজন ২.৫-৩ কেজি এবং মুরগি ২-২.৫ কেজি হয়ে থাকে। তবে ১ কেজি ওজনের সোনালী জাতের মুরগির চাহিদা অনেক বেশী

- সাধারণত এদেরকে ডিম পাড়া মুরগী হিসাবে পালন করা হয় না, এদেরকে বেশীরভাগই ব্রয়লার জাতের মুরগির মত খাবারের জন্য পালন করা হয়। বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের খাদ্য তালিকায় এদের চাহিদা অনেক বেশী।

অত্র প্রকল্পে সিআইজি খামারীগণ নিম্ন জাতের মুরগি পালন করে লাভবান হতে পারেন ঃ

- গ্রামীণ পরিবেশে দেশী জাতের মুরগি পালন (পারিবারিক মুরগি পালন)।
- খামারীদের জন্য ফাওমি/সোনালী মুরগি পালন,
- খামারীদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগি পালন,
- খামারীদের জন্য ব্রয়লার মুরগি পালন

মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক/ উন্নত টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারে নিম্ন কার্যক্রম গ্রহন প্রয়োজন ঃ

- খামারের জায়গা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ,
- বাসস্থান/সেড ব্যবস্থাপনা,
- এক দিনের বাচ্চা ক্রয় ও ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা,
- লিটার ব্যবস্থাপনা,
- তাপ ও আলো ব্যবস্থাপনা,
- সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা,
- মুরগির বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার,
- টিকাদান কর্মসূচী,
- সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণকল্পে জীবনিরাপত্তা।

খামারের জায়গা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ ঃ

- মুরগির ঘর বাসস্থান থেকে একটু দূরে কলাহল মুক্ত পরিবেশে হতে হবে,
- মুরগির ঘর বন্যায় যাতে ডুবে না যায় সে জন্য একটু উঁচুতে হওয়া প্রয়োজন,
- খামারের আশপাশ পঁচা-ডোবা ও নর্দমা মুক্ত হতে হবে,
- মুরগির খামার পরিচালনায় পরিবারের দুই জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাখতে হবে, যাতে একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যজন খামারের কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন,

বাসস্থান/সেড ব্যবস্থাপনা ঃ

- স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মুরগির জন্য অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু জায়গায় ঘর নির্মাণ করতে হয়।
- ঘরের চারপাশে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সুনির্দিষ্ট আলোক ব্যবস্থাপনায় মুরগির খাদ্য রূপান্তরের হার বৃদ্ধি হয়।
- মুরগির ঘর ভালভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হবে, দুপুরের পরে যাতে সূর্যের তাপে সেড বেশী গরম না হতে পারে সেজন্য ঘরের পশ্চিম প্রান্তে সার্ভিস কক্ষ থাকবে। এখানে মুরগির খাদ্য, জীবানুনাশক সহ অন্যান্য সরঞ্জাম থাকবে।
- ঘরের চালা দোচালা হবে। ঘরের চালা ছন, গোলপাতা, বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। টিন ব্যবহার করলে টিনের নীচে অবশ্যই তাপ নিরোধক বা বাঁশের চাটাই দিতে হবে।

- খামারে যদি একের অধিক সেড থাকে তবে সেড থেকে সেডের দূরত্ব ২৫-৩০ ফুট থাকা প্রয়োজন।
- মুরগির সেড নির্মাণে মুরগি পালনের সংখ্যার ভিত্তিতে লম্বা হবে, তবে লম্বায় অনুর্দ্ধ ১০০ ফুট ও চওড়ায় ২০-২৫ ফুট হলে সেড ব্যবস্থাপনায় সহজ হবে।
- সেডের উচ্চতা ৭-১০ ফুট হতে হবে।
- বয়স ভিত্তিক ডিম পাড়া মুরগিকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয় ঃ
  - ষ্টার্টার ০-৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত
  - বাড়ন্ত ৭-২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত
  - লেয়ার ২১-উপরে সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত
- বাণিজ্যিক জাতের ডিম পাড়া মুরগিকে লালন-পালনের জন্য ষ্টার্টার, বাড়ন্ত ও লেয়ার মুরগির জন্য পৃথক পৃথক সেড করতে হবে।
- বাণিজ্যিক জাতের ডিম পাড়া মুরগিকে দু'টি পদ্ধতিতে পালন করা হয়, লিটার পদ্ধতি অথবা খাঁচা পদ্ধতি।
- লিটার পদ্ধতিতে ১০০টি বাচ্চা মুরগির জন্য ৫০ বর্গফুট, ১০০টি বাড়ন্ত মুরগির জন্য ১২০ বর্গফুট এবং ১০০টি ডিমপাড়া মুরগির জন্য ২০০ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হবে।
- খাঁচা পদ্ধতিতে সাধারণত ডিম পাড়া মুরগি পালন করা হয়। খাঁচা পদ্ধতিতে প্রতিটি ডিম পাড়া মুরগির জন্য ১ (এক) বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন।

লিটার পদ্ধতির উপকারিতা ঃ

- মুরগির ঘর শুকনা ও দর্গন্ধমুক্ত থাকে।
- লিটার ব্যবহার করলে মেঝেতে পায়খানা লেপ্টে যায় না।
- মুরগির জন্য আরমদায়ক ও স্বাস্থ্যকর বিছানা তৈরী হয়।
- খাদ্য রূপান্তর হার বেশী হয়।
- লিটারের মধ্যে এক প্রকার ভিটামিন ও আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদান তৈরী হয়।
- ডিমের মধ্যে রক্তকণিকা হয় না।
- ডিম পাড়া শেষে বাতিল মুরগির ওজন বেশী থাকে এবং বিক্রয় মূল্য বেশি হয়।
- লিটারের মুরগি পালন সহজ হয়।
- ব্যবহৃত লিটার উন্নতমানের জৈব সার এবং মাছ ও প্রাণি-পাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার কার যায়।

মাঁচা পদ্ধতির উপকারিতা

- মাঁচার ফাঁক দিয়ে পায়খানা নীচে পড়লে পরিস্কার করতে সুবিধা হয়।
- রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা কম
- মাঁচার উপর স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় থাকে
- মাঁচার উপর মুরগির স্বাচ্ছন্ধবোধ করে
- ডিম পরিষ্কার থাকে।
- তুলনামূলকভাবে লিটার পদ্ধতির চেয়ে মুরগি প্রতি কম স্থানের প্রয়োজন হয়।

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা ও এক দিনের বাচ্চা ক্রয় ঃ

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা ঃ

অল্প বয়সে পালক না হওয়ায় বা ছোট থাকায় শরীর আবৃত্ত হয়না এ জন্য শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম তাপের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় কৃত্রিমভাবে তাপ দেয়াকে ব্রুডিং বলা হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে ব্রুডিং হচ্ছে বাচ্চাকে তাপানো, আর ব্রুডার হচ্ছে যেখানে বাচ্চাকে রেখে তাপানো হয়। ব্রুডিং দুই প্রকার -

- প্রাকৃতিক ব্রুডিং - মুরগির সাহায্যে ব্রুডিং করা হয়।
- কৃত্রিম ব্রুডিং - বৈদ্যুতিক, গ্যাস, কেরসিন ও অন্যান্য তাপের উৎসের মাধ্যমে ব্রুডিং করা হয়।

বাচ্চা ব্রুডিং ঘর ও ব্রুডার ঘরে ব্যবহৃত মূল সরঞ্জাম ঃ

ব্রুডার ঘরের আকার ছোট হওয়াতে তাপ উৎপাদন খরচ কম। এই ঘরে বাচ্চা ব্রুডিং শেষে বাচ্চাগুলোকে গ্রোয়ার হাউজে স্থানান্তর করা হয়। এই সময়ে বাচ্চা স্থানান্তর করতে গিয়ে বাচ্চার ধকল হয় ও রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে। ব্রুডার ঘরে ব্যবহৃত মূল সরঞ্জাম হচ্ছে -

১. ব্রুডার ঃ ব্রুডারের ৩টি অংশ রয়েছে, যেমন-
   ক) হোভার, খ) ব্রুডার হিটার, গ) ব্রুডার গার্ড
২. পানির পাত্র
৩. খাবার পাত্র ঃ খাবার পত্র দু'প্রকার, যেমন-
   ক) প্রথম খাবার পাত্র- কাগজ/চিকবাক্সের ঢাকনি/প্লাষ্টিক ট্রে/থালা, ইত্যাদি
   খ) দ্বিতীয় খাবার পাত্র প্লাষ্টিক বা কাঠের তৈরী ট্রাফ ফিডার, গ্রীল সংযুক্ত ট্রাফ ফিডার, ইত্যাদি

এক দিনের বাচ্চা ক্রয় ঃ

- সবসময় ভাল হ্যাচারী থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে।
- দুর্বল বাচ্চা ক্রয় করে লাভবান হওয়া কঠিন, কেননা মৃত্যুর হার বেশী হয়।
- বাচ্চা ক্রয় করার সময় খেয়াল রাখতে হবে - বাচ্চার পেটের নাভি এবং মলদ্বার যেন শুকনো থাকে।
- বাচ্চা সতেজ ও ঝর ঝরা হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বাচ্চার আকৃতি হবে গোল, চোখ হবে উজ্জ্বল।
- বাচ্চা বেশ চটপটে ও সাজাগ থাকবে।
- সকল বাচ্চার রং এবং সাইজ যেন একই থাকে।
- বাচ্চার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন কোন প্রকার বিকৃতি থাকা যাবে না।

কৃত্রিম ব্রুডিং করার নিয়ম ঃ

- মুরগির ঘরে নতুন করে মুরগীর বাচ্চা উঠানোর ৩ দিন পূর্বে পুনরায় জীবানুমুক্ত করণ করতে হবে।
- ব্রুডারে বাচ্চা উঠানোর কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে,
- বাচ্চা খামারের পৌঁছানোর পরপরই প্রথমে গ্লুকোজ, ওয়াটার সলিউবল মাল্টিভিটামিন (WS) এবং ভিটামিন 'সি' মিশ্রিত পানি খাওয়াতে হবে (প্রতি লিটার পানিতে গরমের দিনে ৫০ গ্রাম ও শীতের দিনে ২৫-৩০ গ্রাম গ্লুকোজ, ০.৫ গ্রাম ওয়াটার সলিউবল মাল্টিভিটামিন ০.৫ গ্রাম ভিটামিন সি), এইভাবে অন্তত ৬ ঘন্টা পানি খাওয়ানোর পর বাচ্চাকে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে,
- ব্রুডারের নিচে পর্যপ্ত তাপের জন্য প্রথম সপ্তাহে ব্রুডার থেকে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ ওয়াটের ৪টি বাল্ব ঝুলিয়ে আলো দেয়া প্রয়োজন,
- শীতকালে সাধারণতঃ ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরম কালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হবে। ইলেকট্রিক বাল্ব, গ্যাস চুলা, কেরোসিনের চুলা ও বি,এল,আর,আই উদ্ভাবিত ব্রুডার দিয়ে ব্রুডিং করা যায়।

- চিক গার্ডে হচ্ছে বাচ্চাকে তাপা দেবার জন্য ব্রুডার বক্সের চারিদিকে ঘেরাও করে দেয়া, যাতে বাচ্চা নির্দিষ্ট বেষ্টনীর বাহিরে যেতে না পারে। চিক গার্ডের ভিতরে বাচ্চা ছাড়ার আগেই পানির পাত্র সরবরাহ করতে হবে ।

মুরগির বাচ্চা ব্রুডিং এর সময় অন্যান্য করণীয় ঃ

- লিটার বেশী ভিজা হলে যেমন বিভিন্ন প্রকার গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তেমনি ককসিডিয়া, কৃমি ও রোগ জিবাণুর বংশ বিস্তার বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বাচ্চার দেহে পালক গজানোর হার কমে যায়।
- বাচ্চা তাপের উৎসের নীচে বেশী জমা হওয়ার কারণে সেখানে বেশী মলত্যাগ করে, ফলে লিটার দ্রুত আদ্র হয়।
- লিটার বেশী শুকনা হলে বাচ্চার দেহ হতে জলীয় অংশ শোষন করার ফলে ডি-হাইড্রেশন হয়।
- প্রতিসপ্তাহে ব্রুডারের তাপমাত্রা ৫ ফাঃ কমাতে হয় যতক্ষণ না ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার (৭৫ফাঃ) সমান হয়।
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চা ব্রুডার গার্ড সরিয়ে বাচ্চার হাঁটা চলার স্থান প্রশস্ত করতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে ২ সপ্তাহ এবং শীতকালে ৩ সপ্তাহ বয়সের পর ব্রুডার গার্ডের প্রয়োজন হয় না।
- গ্রীষ্মকালে ৩ সপ্তাহের পর এবং শীতকালে ৪ সপ্তাহের পর ব্রুডার তাপের প্রয়োজন হয় না, এ সময়ে হোভার উঁচুতে তুলে রাখা হয়।

ব্রুডারে বাচ্চার আচরণ পরীক্ষাঃ

- ব্রুডারে বাচ্চা প্রদানের পর বাচ্চার আচরণ পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চার জন্য অনুকূল তাপমাত্রা বাচ্চার আচরণ দেখে অনুমান করতে হয়, যেমন-
    - ব্রুডারে তাপ বেশি হলে বাচ্চা তাপের উৎস হতে দূরে থাকবে ও ব্রুডার গার্ডের গা ঘেষে জমা হবে।
    - ব্রুডারে তাপ কম হলে তাপের উৎসের নীচে বেশী তাপের আশায় বাচ্চা ভীড় করে এবং পরস্পর
    - বাচ্চা জড়াজড়ি করে গরম হতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় চাপাচপিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যেতে পারে।
    - তাপ বাচ্চার অনুকূলে থাকলে বাচ্চা স্বতঃস্ফূর্ত থাকে এবং সুষ্ঠুভাবে খাদ্য খায় ও পানি পান করে।
    - বাচ্চা স্বতঃস্ফুর্তভাবে চলাচল ও পানি পান না করলে বুঝতে হয় বাচ্চ অসুস্থ্য
    - হোভার অথবা তাপের উৎস উঁচু-নীচু করে তাপ কম-বেশী করতে হবে।
    - ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর রুটিন মত পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নয়। বার বার ব্রুডার ঘরে প্রবেশ করে
- ব্রুডারে বাচ্চার আচরণ পরীক্ষার পর ব্যবস্থা নিতে হয়। এ জন্য ২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার অত্যন্ত সংকটময় সময় ।
- হঠাৎ করে আলো নিভে যাওয়া, ঘরের তাপমাত্রা পরিবর্তন, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, খাদ্য ও পানির পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রকার শব্দ ও হট্টগোল বাচ্চার ধকল সৃষ্টি করে। তাই বাচ্চার আচরণ দেখে এ সমস্ত ধকল প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর বাচ্চার পানি পান করার প্রবণতা পরীক্ষা করতে হবে। প্রত্যেক বাচ্চা যাতে সহজে পানি পান করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রয়োজন হলে হাতে ধরে পানি পান করাতে হয়।

লিটার ব্যবস্থাপনা ঃ

- লিটার হচ্ছে মুরগির বিছানা, যা ধানের তুষ হলে ভাল হয়।

- লিটার প্রস্তুতে উপকরণ হচ্ছে ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ও ধানের তুষের মিশ্রণ। কাঠের গুড়া ও ধানের তুষ মিশ্রণে সর্বোচ্চ ৬০% কাঠের গুড়া ব্যবহার করা হলে মুরগির স্বাস্থ্য ভাল থাকে।
- শীত থেকে রক্ষার জন্য লিটার পুরু করতে হবে (বাচ্চা ব্রুডিং এর জন্য ২-৩ ইঞ্চি এবং পুলেট/বড় মুরগির জন্য ৪-৫ ইঞ্চি)।
- লিটারে কম আদ্রতা বা বেশী আদ্রতা উভয়ই ক্ষতিকর।
- লিটার ব্যবস্থাপনা ঃ
  - লিটার ১ম মাস সপ্তাহে ২বার এবং ২য় মাস ১৫দিন অন্তর উল্টে-পাল্টে দিতে হবে
  - ২ মাস পর লিটারের কার্যকারিতা পরিপূর্ণ হয় (বিল্ডআপ লিটার) এবং এই সময় থেকে মুরগি নিজেরাই লিটার উল্টো-পাল্টানোর কাজটি করে থাকে।
  - তাই ২ মাস পর প্রতি মাসে এক বার লিটার পরিচর্যা করলে চলে।
  - ৮ সপ্তাহ পর প্রতি ১০০টি মুরগির জন্য ২২৫ গ্রাম কাঁকর (অতি ছোট ছোট পাথর) লিটারের উপর ছিটিয়ে দিলে মুরগীর হজমে সহায়তা হয়।
  - মুরগির মলে ৬০-৭০% পানি থাকে, তাই লিটারে যাতে আদ্রতা বৃদ্ধি না পায় সে জন্য সেডে বাতাস চলাচলের সষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে।
  - লিটারে আদ্রতা বাড়লে ১০-১৫ বর্গফুট লিটারে ১ কেজি চুন পাউডার করে লিটারের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে।
  - ১০০ বর্গফুট লিটারের উপর ১০-১৫ গ্রাম ব্লিচিং পাওডার ছিটিয়ে দিলে লিটারের গন্ধ কমে।

সেডে পানির ব্যবস্থাপনা ঃ

- মুরগির সেডে লম্বা বা ঝুলন্ত পানির পাত্র থাকতে হবে,
- বড় মুরগির জন্য সেডে প্রতি ১০ ফিট অন্তর পানির পাত্র বসাতে হবে,
- মুরগিকে পর্যাপ্ত পরিমানে পানি সরবরাহ করতে হবে,
- মুরগির সেডে সবসময়েই পানি সরবরাহ থাকতে হবে। পানি সরবরাহ কম হলে উৎপাদন কমে যাবে,
- সেডে তাপ বাড়লে মুরগি তুলনামূলকভাবে পানি বেশী খাবে এবং তাপ কমলে পানি কম খাবে।

মুরগির তাপ ব্যবস্থাপনা ও তাপ মাত্রার প্রভাব ঃ

- মুরগির গ্রহণযোগ্য তাপমাত্রা ২১°-২৬° C (৭০°-৭৯° F), তবে খাদ্যের বিভিন্ন উপকরণের পরিমান কম/বেশী করে ৩২° C (৯০° F) পর্যন্ত তাপমাত্রাতেও উৎপাদন ঠিক রাখা যায়।
- পরিবেশের সাথে মুরগীর দৈহিক তাপমাত্রা সম্পর্কযুক্ত। তাই আবহাওয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মুরগির দৈহিক তাপমাত্রাও বেড়ে যায়, ফলে উৎপাদন কমে যাবে।
- গরম আবহাওয়ায় বড় মুরগির তুলনায় ছোট বাচ্চার সহ্য করার ক্ষমতা বেশী থাকে।
- আবহাওয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে মুরগি বেশী পানি পান করবে, ফলে পায়খানার সাথে পানির পরিমান বৃদ্ধির কারণে লিটার ভিজা থাকে।
- গরম কালে দিনে যে পরিমান খাদ্য গ্রহণ কম করবে, রাত্রে ১/২ ঘন্টা আলো জালিয়ে খাবার দেয়া হলে তা পুরণ হবে।
- দীর্ঘ সময় উচ্চ তাপমাত্রায় মুরগির উৎপাদন, ডিমের আকার ও খোসার মান খারাপ হবে।

আলো ব্যবস্থাপনা ও এর প্রভাব ঃ

- মুরগির বাচ্চাকে অধিক হারে খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য মুরগীর ঘরে ০-৩ দিন পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা আলো থাকা প্রয়োজন এবং পরবর্তীতে ৪-৭ দিন পর্যন্ত ২৩ ঘন্টা আলো থাকা প্রয়োজন।
- ২-১৮ সপ্তাহ মুরগির বাড়ন্ত সময়। এ সময়ে মুরগির ঘরে আলো কমিয়ে ১২ ঘন্টায় নিয়ে আসতে হবে। বাড়ন্ত অবস্থায় আলো বেশী দেয়া হলে মুরগির পরিপূর্ণতা আগে হবে, ডিম পাড়া আগে শুরু করবে, ডিমের আকার ছোট হবে এবং মোট ডিম উৎপাদন কমে যাবে। তাই দিনের আলো ১২ ঘন্টার বেশী হলে মুরগির ঘরে ছালার চট দিয়ে অন্ধকার করে নিতে হবে।
- ১৯ সপ্তাহ থেকে মুরগি ডিম পাড়া শুরু করে, তাই ১৯ সপ্তাহ থেকে ডিম পাড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুরগির ঘরে ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- রাত্রে তিন ঘন্টা অন্ধকারের পর এক ঘন্টা আলো দিলে কম খাদ্যে বেশী ডিম পাওয়া যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন দৈনিক মোট আলো ১৬ ঘন্টার চেয়ে বেশী না হয়।
- প্রতি ১০০ বর্গমিটার মেঝেতে আলোর জন্য ৪০ ওয়াটের বাল্ব আবশ্যক। সে হিসাব করে বাল্ব এমনভাবে বন্টন করতে হবে যেন সর্ব্বোচ্চ ৬০ওয়াটের চেয়ে বেশী ওয়াটের বাল্ব লাগানোর প্রয়োজন না হয়। বেশী ওয়াটের বাল্ব লাগানো হলে সেডের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে।
- প্রতি সপ্তাহে একবার বাল্ব পরিস্কার করা হলে আলোর উজ্জলতা বৃদ্ধি পাবে।

২য় সেশন ঃ

দেশী মুরগি পালন কৌশল ও দেশী মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

দেশী মুরগি পালন কৌশল

দেশী মুরগি সাধারণত পারিবারিক পদ্ধতিতে পালন করা হয়। এরা বাড়ীর আঙ্গিনায় চড়িয়ে-বেড়িয়ে নিজেরাই নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের জন্য বাহির থেকে তেমন কোন খাদ্য সরবরাহ করা হয় না বা তেমন কোন যত্ন নেয়া হয় না। ফলে এদের উৎপাদনও কম হয়। অন্যদিকে একটি দেশী মুরগী ডিমে তা দিয়ে ১২-১৪টি বাচ্চা ফুটালেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ২/৩টি বাচ্চা বেঁচে থাকে। অথচ উন্নত প্রযুক্তি/কৌশল অবলম্বন করে দেশী মুরগির উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। বর্তমানে বাজারে দেখা যায় ব্রয়লার মুরগি চেয়ে দেশী মুরগির দাম প্রায় দ্বিগুন। ফলে কৃষকগণ দেশী মুরগি পালনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে অধিক লাভবান হবেন এবং তাঁর পারিবারিক আয় বৃদ্ধিসহ অপুষ্টি লাঘবে যথেষ্ট সহায়তা হবে।

গবেষনায় দেখা গেছে দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাজারে বিক্রি করার চেয়ে ডিম ফুটিয়ে ৮-১২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চা মুরগি লালন-পালন করে বাজারে বিক্রি করলে লাভ বেশী হয়। তবে একটি দেশী পারিবারিক মুরগির খামারে এক সংগে কমপক্ষে ১০টি মুরগি ও ১টি মোরগ থাকতে হবে। মোরগটি অবশ্যই বড় আকারের হতে হবে, তা না হলে মুরগি ডিমে তা দেয়ার পর ডিম ফুটানোর সংখ্যা কম হবে। পারিবারিক পদ্ধতিতে এভাবে মুরগি পালনকে এক মোরগের সংসারও বলা যেতে পারে।

এই পদ্ধতিতে মুরগি পালনে শুরুতে মুরগিগুলোকে ক্রিমি নাশক ঔষধ খাওয়ানোর পর রানীক্ষেত রোগের টীকা দিতে হবে। মুরগির গায়ে উকুন থাকলে তাও মেরে নিতে হবে। পারিবারিক পদ্ধতিতে এতগুলো মুরগি লালন-পালন করায় বাড়ীর আঙ্গিনায় চড়িয়ে-বেড়িয়ে তারা চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। তাই এ ক্ষেত্রে বাজার থেকে লেয়ার মুরগির সুষম খাদ্য ক্রয় করে প্রতিদিন প্রিতিটি মুরগিকে ৫০-৬০ গ্রাম করে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তাহলে একদিকে ডিম উৎপাদন বাড়বে এবং ডিমের মানও ভাল থাকবে। মুরগি ডিম পাড়া শেষ হলে এক সময়ে উমে আসবে। তখন একটি মুরগির নীচে ১৪-১৬টি ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

খামারের আদলে বাঁশ/কাঠ, খড়/তাল/নারকেল/সুপারি পাতা, ইত্যাদি দিয়ে যত কম খরচে পারা যায় স্থানান্তর যোগ্য মুরগির ঘর তৈরী করতে হবে। ঘরটি মজবুত করতে হবে যেন বন্যপ্রাণি ঘরে প্রবেশ না করতে পারে। ঘর তৈরীর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঘরটি সঠিক মাপের হয় এবং ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচল করতে পারে । ঘর বানানোর পর ঘরটিকে বাড়ীর সবচেয়ে নিরিবিলি স্থানে রাখতে হবে। মাটির উপর ইট দিয়ে তার উপর ঘরটি বসাতে হবে। তাহলে ঘরটি বেশী দিন টিকবে।

ফুটানোর ডিম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মুরগি ডিম তা দিয়ে বাচ্চা ফুটানো ঃ

মুরগি ডিম পাড়ার পর ডিম সংগ্রহের সময় শুধু ভাল সাইজের/আকারের ডিমের গায়ে হালকা করে পেন্সিল দিয়ে তারিখ লিখে ঠান্ডা জায়গায় ডিম সংরক্ষণ করতে হবে। অন্যান্য ডিম খাবার ডিম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ডিম পাড়া শেষ হলেই মুরগি কুঁচো হবে। তখন গরম কালে ৫-৬ দিন বয়সের ডিম এবং শীত কালে ১০-১২ দিন বয়সের ডিম ফুটানোর জন্য নির্বাচন করতে হবে। উমে বসানো মুরগির সামনে একটি পাত্রে সবসময় খাবার ও অন্য একটি পাত্রে পানি দিয়ে রাখতে হবে, যাতে সে ইচ্ছে করলেই সেখান থেকে খেতে পারে। তাহলে ডিম তা দেয়ার সময় মুরগির ওজন হ্রাস পাবে না ও বাচ্চা তোলার পর মুরগি আবার তাড়াতাড়ি ডিম পাড়া শুরু করবে। ডিম তা দেয়ার ৭-৮ দিন পর রাতের বেলায় অন্ধকারে মোমবাতির আলোতে ডিম পরীক্ষা করলে ডিমে বাচ্চা না থাকলে তা সহজেই চেনা যাবে। তখন এ ধরণের ডিম আর তা না দিয়ে সরিয়ে ফেলতে হবে।

প্রতিটি ডিমের গায়ে সমভাবে তাপ লাগার জন্য দিনে কম পক্ষে ৫-৬ বার ওলট পালট করতে হয়। সাধারণত দেশী মুরগি এ কাজটি সহজে করে থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে যদি মুরগী এ কাজটি না করে তখন আমাদেরকেই এ একাজটি করে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন এ কাজটি করতে গিয়ে মুরগি বিরক্ত না হয়। ডিম ফুটার জন্য বাতাসের আদ্রতাও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত ডিম তা দেয়ার ১-১৮দিন পর্যন্ত বাতাসের আদ্রতা ৫৫% এবং ১৯-২১ দিন সময়ে ৭০-৮০% থাকলে বাচ্চা ফুটার হার বেশী হয়। বাতাসের আর্দ্রতা মাপার জন্য বাজারে যন্ত্র পাওয়া যায় এবং এর দামও কম। তাই বাতাসের আর্দ্রতা মাপার জন্য আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। আমাদের দেশে সধারণত খুব গরম ও শীতের সময় বতাসের আদ্রতা কম থাকে। এ সময়ে ডিম উমে বসানো হলে এবং বাতাসের আদ্রতা প্রয়োজন অনুযায়ী কম থাকলে দৈনিক দু'বার একটি পরিষ্কার কাপড় কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে হাত দিয়ে চিবিয়ে পানি ফেলে দিতে হবে। এর পর উক্ত ভিজা কাপড় দিয়ে ডিম মুছে দিলে প্রয়োজনীয় আদ্রতা পাওয়া যাবে। উক্ত ব্যবস্থা ঝামেলা মনে হলে দৈনিক দু'বার হাত কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে হালকা ভাবে ঝেড়ে হাতের বাকি পানিটুকু ডিমের উপর ছিটিয়ে দিলেও প্রয়োজনীয় আদ্রতা পাওয়া যাবে। ডিম থেকে বাচ্চ ফোটার পর ৫-৬ ঘন্টা পর্যন্ত মা মুরগিকে দিয়ে বাচ্চাকে উম দিতে হবে। তাতে বাচ্চা শুকিয়ে ঝরঝরে হবে। গরম কালে বাচ্চার বয়স ৩-৪ দিন এবং শীত কালে ১০-১২ দিন পর্যন্ত বাচ্চার সাথে মাকে থাকতে দিতে হবে। এ সময়ে মুরগি নিজেই বাচ্চাকে উম দিবে। এতে কৃত্রিম উমের (ব্রুডিং) প্রয়োজন হবে না। এ সময়ে মা মুরগিকে খাবার দিতে হবে। মা মুরগির খাবারের সাথে বাচ্চার খাবারও আলাদা করে দিতে হবে। বাচ্চা গুলো মায়ের সাথে থেকে খাবার খাওয়া শিখবে। উক্ত সময়ের পর মুরগিকে বাচ্চা থেকে আলাদা করতে হবে এবং কৃত্রিম ভাবে বাচ্চাকে ব্রুডিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। তখন থেকেই মুরগির বাচ্চা পালন পদ্ধতির সব কিছুই পালন করতে হবে।

এ পর্যায়ে মা মুরগিকে আলাদা করে লেয়ার খাদ্য দিতে হবে এবং মুরগিকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার জন্য পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন দিতে হবে। এ সময়ে মা মুরগি ও বাচ্চা মুরগিকে এমনভাবে আলাদা করতে হবে যেন বচ্চারা মুরগির দৃষ্টির বাহিরে থাকে। এমন কি বাচ্চার চিচি শব্দও যেন মা মুরগি শুনতে না পায়। তা না হলে মা ও বাচ্চার ডাকা ডাকিতে কেউ কোন খাবার বা পানি কিছুই খাবে না। তবে আলাদা করার পর অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে গেলে আর কোন সমস্যা থাকে না ।

প্রতিটি মুরগিকে এ সময় ১৫ দিনের জন্য ৮০-৯০ গ্রাম লেয়ার খাবার দিতে হবে। সাথে সাথে ৫-৭ ঘন্টা চড়ে বেড়াতে দিতে হবে। এর পর পূর্বের ন্যয় দৈনিক ৫০-৬০ গ্রাম লেয়ার খাবার দিলে চলবে। প্রতিটি মুরগিকে ৩-৪ মাস পর পর কৃমির ঔষধ এবং ৪-৫ মাস পর পর রানীক্ষেত রোগের টীকা দিতে হবে। সাধারণত একটি দেশি মুরগি ডিম পাড়ার জন্য ২০-২৪ দিন সময় নেয়। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য ২১ দিন সময় নেয়। বাচ্চা লালন পালন করে বড় করে তোলার জন্য ৯০-১১০ দিন সময় নেয়। এ ভাবে ডিম থেকে বাচ্চা বড় করা পর্যন্ত একটি দেশী মুরগির উৎপাদন শেষ করতে স্বাভাবিক অবস্থায় ১২০- ১৩০ দিন সময় লাগে। কিন্তু মা মুরগিকে বাচ্চা থেকে আলাদা করার ফলে এই উৎপাদন সময় ৬০ -৬২ দিনের মধ্যে সমাপ্ত করা যায়। অর্থাৎ অর্ধেক কমে যাবে ও বাকি সময় মুরগিকে ডিম পাড়ার কাজে ব্যবহার করা যাবে। ফলে ডিম পাড়ার জন্য মুরগি বেশী সময় পাবে ও ডিম উৎপাদন বেশী হবে। এই পদ্ধতিতে বাচ্চা ফুটার সংখ্যাও বেশী হয় এবং বাচ্চা মুরগির মৃত্যুর হারও অনেক কম হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন দ্বিগুনের চেয়েও বেশী পাওয়া যায়।

মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা

খাদ্য উপকরণে যে পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমানে থাকে তাকে সে জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, ইত্যাদি)।
- আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল, ইত্যাদি)।
- চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট, হাঁস-মুরগরি তৈল, ভেজিটেবল অয়েল, সার্কলিভার ওয়েল, ইত্যাদি)।
- ভিটমিন জাতীয় খাদ্য (শাকসব্জি ও কৃত্রিম ভিটামিন)
- খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক , ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবন, ইত্যাদি)।
- পানি ঃ দেহ কোষে শতকরা ৬০- ৭০ ভাগ পানি থাকে। তাই কোন প্রাণী খাদ্য না খেয়েও কিছু দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া সামান্য কিছু দিনের বেশী বাঁচে না।
    - সাধারণত দেহ থেকে পানির ক্ষয় হয় মলমূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ।
    - অপরদিকে পানি আহরিত হয় পানি পান করে, রসালো খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টি উপদানের অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
    - দেহের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।
    - ডিমের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।
    - **মুরগির দেহে পানির কাজ ঃ**
        - খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য বস্তু নরম ও পরিপাকে সহায্য করে।
        - খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টি উপাদান তরল করে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহণ করে।
        - দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দেহকে সতেজ রাখে।
        - দেহের ভিত্তিতে দুষিত পদার্থ অপসারন করে।
        - দেহের গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস, হরমোন,এনজাইম এবং রক্ত গঠনে ভূমিকা রাখে।

শর্করা জাতীয় খাদ্য ২ (দুই) প্রকার

- দানাদার ঃ সকল প্রকার দানাদার খাদ্যশস্য যেমন, ভুট্টা গম , যব,কাওন, চাউল, ইত্যাদি।
- আঁশ ঃ সকল প্রকার দানাদার খাদ্যের উপজাত যেমন চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, ভুট্টার গুটেন, কাসাভা, ইত্যাদি।

- মুরগির খাদ্যের বেশীর ভাগ শর্করা পুষ্টি উপাদান যেমন দানাদার শতকরা ৪০ হতে ৬০ ভাগ এবং উপজাত অংশ শতকরা ১০ হতে ৩০ ভাগ ব্যবহার করা হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্য আবার ২ প্রকার

- প্রানীজ আমিষ ঃ যে সমস্ত আমিষের উৎস প্রানী থেকে হয় তাকে প্রানীজ আমিষ বলে। যেমন, শুটকি মাছ , মিট মিল, ফিদার মিল, লিভার মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেট, ইত্যাদি।
- উদ্ভিদ আমিষ ঃ যে সমস্ত আমিষের উৎস উদ্ভিদ থেকে হয় তাকে উদ্ভিদ জাতীয় আমিষ বলে। যেমন, সায়াবিন মিল, তিলখৈল , তৈল বীজের খৈল, তুলা বীজের খৈল, সবুজ শাকসব্জি, ইত্যাদি।

পোল্ট্রি শিল্পে ৭০% খরচ হয় খাদ্যে। বয়সভেদে ডিম পাড়া জাতের মুরগির খাদ্য মূলত তিন প্রকার -

- ০-৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চা মুরগির খাদ্য (ষ্টার্টার মুরগী)
- ৭-২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাড়ন্ত মুরগির খাদ্য (বাড়ন্ত মুরগী)
- ২১-উপরে সপ্তাহ বয়সের ডিম পাড়া মুরগির খাদ্য (লেয়ার মুরগী)

- মুরগির খাদ্য প্রস্তুত করতে মূলত গম/ভূট্টা ভাঙ্গা, চালের কুড়া, ঝিণূক চূর্ণ, লবন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, প্রোটিন কন্সেনট্রেট এর প্রয়োজন হয়।
- পুষ্টিমান হিসাবে খাদ্যে মোট ৬টি উপাদান থাকে, যেমন- আমিষ, শর্করা, খনিজ, চর্বি বা তৈল, ভিটামিন ও পানি যা বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন খাদ্য উপকরণে উপস্থিত থাকে
- দেশে বর্তমানে উন্নত মানের প্রস্তুতকৃত সব বয়সের মুরগির খাদ্য সর্বত্র পাওয়া যায়। খামারে খাদ্য প্রস্তুত করতে বিভিন্ন উপাদান সবসময়ে সহজপ্রাপ্য না হওয়ায় এখন বাণিজ্যিক মুরগি পালনে খামারীগন বাজারে প্রাপ্ত প্রস্তুতকৃত মুরগীর খাদ্য ব্যবহার করে থাকেন।
- তবে লেয়ার খাদ্যে নির্দিষ্ট পরিমানে আমিষ থাকা অত্যান্ত জরুরী, যা হতে হবে-
  - ডিম পাড়ার পূর্বে ১৩%
  - ডিম পাড়া শুরু করলে ১৬%
  - ডিম পাড়া সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছলে ১৭-১৯%
  - ডিম উৎপাদনের চক্রের শেষ পর্যায়ে ১৪%
- মুরগীর খাদ্যে আমিষের পরিমান কম হলে ডিমের আকার ছোট হয় এবং আমিষের পরিমান বেশী হলে ডিমের আকার বড় হবে। তাই আমিষের পরিমান সঠিক হওয়া প্রয়োজন।
- মরগির উৎপাদন সঠিক রাখার জন্য বাজারে যে ফিডমিলের খাদ্য ভাল তা খাওয়ানো প্রয়োজন। তবে হঠাৎ খাদ্য পরিবর্তন করলে ডিম উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দেশী জাতের মুরগির খাদ্য ঃ

- **সম্পুরক খাদ্য সরবরাহ ঃ** প্রতিটি বয়স্ক মুরগিকে চড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি দৈনিক ৩৫ গ্রাম সম্পুরক খাদ্য খেতে দিতে হবে।
- ছোট খামারীগণ সারা বছর ১টি মুরগী বাচ্চা ফুটানোর জন্য ব্যবহার করবেন। বাকী ২টি মুরগি সারা বছর ডিম উৎপাদন করবে।
- মাঝারী ও বড় খামারীগণ প্রতিবারে তাদের ৬টি মুরগির মধ্যে ২টি মুরগিকে ডিম ফুটানোর জন্য বসাবে, বাকী ৪টি মুরগি সারা বছর ডিম উৎপাদন করবে।

- ছোট বাচ্চাগুলোকে প্রথম ৬ সপ্তাহ প্রয়োজনীয় সম্পুরক খাদ্য ফিডারের ভিতর দিতে হবে। ৬ সপ্তাহের পর সম্পুরক খাদ্যের পরিমান ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দিতে হবে। বাচ্চা ফোটার পর প্রথম ৪/৫ দিন বাচ্চার ফিডারের ভিতর তাদের মাকেও খেতে দিতে হবে। কেননা ছোট বাচ্চা প্রথম কয়েক দিন মাকে ছাড়া খাদ্য খায় না।
- দশ সপ্তাহ বয়সে প্রতিটি ছোট বাচ্চার জন্য সম্পুরক খাদ্যের পরিমান হবে দৈনিক ৩৫ গ্রাম। ছয় থেকে দশ সপ্তাহ বয়সকালীন সময়ে ছোট বাচ্চাগুলো মুরগীর সাথে বাড়ির আঙিনায় চড়ে খেতে অভ্যস্থ হবে।

লেয়ার মুরগির সংজ্ঞা ও লেয়ার মুরগির ডিম উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যঃ

সাধারণত মুরগি ১৮ সপ্তাহ থেকে ডিম পাড়া শুরু করে এবং ৫২ সপ্তাহ পর্যন্ত ডিম পাড়ে। তাই এর পর খামারে ঐ মুরগি পালন করা ঠিক নয়। বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগি সাভাবিক অবস্থায় ডিম উৎপাদনের পরিমান হচ্ছে -

- ২০ সপ্তাহ বয়সে শতকরা ৫ ভাগ ডিম পাড়তে শুরু করে।
- ২১ সপ্তাহ বয়সে শতকরা ১০ ভাগ ডিম উৎপাদন হয়।
- ২৬ হতে ৩২ সপ্তাহ বয়সে সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন হয়।
- সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন শুরুর পর কিছুদিন স্থিতিশীল থাকে । এ সময় ডিমের আকার তেমন বড় হয় না। পরবর্তীতে উৎপাদন হার কমতে থাকে এবং ডিমের আকার বড় হতে থাকে।
- ৫০ সপ্তাহ বয়সের পর ডিমের আকার স্থিতিশীল হয় এবং ৪০ সপ্তাহ বয়সের পর ওজন বৃদ্ধি স্থিতিশীল হয়।

৩য় সেশন

লেয়ার মুরগির ডিমপাড়া বাক্স, ডিম সংগ্রহ, ডিম বাছাই ও গ্রেডিং; মুরগির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যা আলোচনা করতে হবে ঃ

ডিমপাড়া বাক্স,

- ডিমপাড়া বাক্সের ধরন ঃ ডিম পাড়ার জন্য প্রতিটি খোপের স্থান ১২ ইঞ্চি/১৪ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১৪ ইঞ্চি থাকতে হবে।
- এই বাক্স একক বা কলোনি টাইপ হতে পারে।
- ৪-৫ টি মুরগির জন্য একটি খোপ ব্যবহার করা যাবে এই অনুপাতে ঘরে ডিম পাড়ার বাক্স দিতে হয়।
- বাক্সে যথেষ্ট ভেন্টিলেশন যুক্ত কিন্তু অন্ধকার হওয়া বাঞ্ছনীয় ।
- বাক্সের সম্মুখে মুরগি উঠার জন্য প্লাটফরম থাকে।
- প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ডিম পাড়ার বাক্স ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ডিম উৎপাদন শুরু করার ১ সপ্তাহ আগে ডিমের বাক্স স্থাপন করতে হবে এবং ডিমের বাক্সের
- দরজা দিনের বেলায় খোলা রাখতে হবে ।
- বাক্সের নিচে ৬ ইঞ্চি হতে ১ ফুট উচুঁ থাকা প্রয়োজন, অন্যথায় লিটার পরিচর্যায় অসুবিধা হয় ।
- ডিমের বাক্সের ভিতর ডিম পাড়ার জন্য আরামদায়ক বিছানা অর্থাৎ লিটার ব্যবহার করতে হবে।
- ডিমের বাক্সের ভিতর ডিম পাড়ার জন্য অভ্যস্থ করতে পূর্ব থেকে ১টি ডিম স্থাপন করলে ভাল হবে।
- ডিমের বাক্স ঘরের ভিতর কিছুটা অন্ধকার স্থানে স্থাপন করা উচিত।

ডিম সংগ্রহ

- শীতের সময় সকাল ১০ থেকে ১১টা এবং বিকাল ৪টা থেকে ৪.৩০টার সময় ডিম সংগ্রহ করতে হয়।

- গরমের সময় সকাল – বিকাল ছাড়াও দুপুরে আর একবার ডিম সংগ্রহ করতে হয়।
- সন্ধ্যার সময় বাক্সের ভিতর কোন ডিম না রেখে সকালে দরজা খোলার সময় ১টি করে ডিম রাখা হয়।

ডিম বাছাই ব্যবস্থাপনা

- ফাটা ডিম সাথে সাথে পৃথক না করলে সমস্ত ডিম নষ্ট হয়ে যাবে।
- ডিমের শেল পাতলা হলে খাদ্যের পুষ্টি মান পরীক্ষা করতে হয়।
- ডিমপাড়া বাক্সের বিছানা প্রতিদিন পরিষ্কার ও প্রয়োজনে নতুন লিটার সামগ্রী যোগ করতে হবে।
- ডিম সংগ্রহের সময় ডিমের ট্রেতে ডিম সংগ্রহ করতে হবে।
- অসুস্থ ও অনুৎপাদনশীল মুরগি পৃথক করতে হয়।
- ডিম সংগ্রহের সময় ডিমের মোটা মাথা উপরের দিকে এবং সরু মাথা নিচের দিকে থাকবে।

ডিমের গ্রেডিং

- ডিম বাজার জাত করার পূর্বে ডিম বাছাই ও গ্রেডিং করতে হয়।
- ডিমের আকার ও ওজন অনুসারে ডিম গ্রেডিং করতে হয়।
- দুই কুসুম বিশিষ্ট ডিমগুলোকে আলাদা করতে হয়।

মুরগীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ
লেয়ার মুরগির স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় করণীয় ঃ

- প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় মুরগির আচরণ পরীক্ষা করতে হবে।
- আবহাওয়ার তাপমাত্রা অনুসারে পানি পান করার পরিমান যাচাই করতে হবে।
- খাদ্য খাওয়া ও পানি পান করার পরিমানের উপর মুরগির স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে।
- ঘরে মুরগির মৃত্যূ হলে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে হয় এবং দ্রুত মৃত মুরগির শৎকারের ব্যবস্থা করতে বেবে।
- মুরগিকে নিয়মিত টীকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।
- স্থানীয় ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শে খাদ্য বা পানির সাথে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মুরগির পালন পদ্ধতি অনুসারে মেঝেতে স্থান নির্ধারণ হতে হবে।
- খামারের জৈব নিরাপত্তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

মুরগীর নিম্নে বর্ণিত রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা -

- ❖ রানীক্ষেত
- ❖ ফাউল বসন্ত
- ❖ রক্ত আমাশয় বা ককসিডিওসিস
- ❖ ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস
- ❖ ফাউল কলেরা,
- ❖ গাম্বোরো,

রানীক্ষেত ঃ

- মুরগির রানীক্ষেত রোগের জীবানু একপ্রকার ভাইরাস। সাধারনতঃ সকল বয়সের ও সকল জাতের মোরগ-মুরগিই রানীক্ষেত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত মোরগ-মুরগি দ্বার এ রোগ খামারে ছড়িয়ে পড়ে। বাজার থেকে রোগাক্রান্ত মোরগ-মুরগি কিনে আনলেও এ রোগ খামারে ছড়াতে পারে। রানীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মোরগ-মুরগির লক্ষন ঃ
    - ➢ চুনা বা সবুজ রং এর রক্তাক্ত কিংবা তরল পায়খানা করবে।
    - ➢ শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শব্দ করবে এবং দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নেবে।
    - ➢ পাখা ছেড়ে দিয়ে ঝিমাতে থাকে।
    - ➢ বাচ্চা মোরগ-মুরগি হা করে শ্বাস নেবে।
    - ➢ এ রোগ থেকে মোরগ-মুরগি বেঁচে গেলে অনেক সময় ঘাড় বাঁকা হয়ে যায় এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে।
    - ➢ খাওয়া-দাওয়া ও ডিম পাড়া বন্ধ করে দেবে।
    - ➢ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগাক্রান্ত হওয়ার এক সপ্তাহের মাধ্যেই মৃত্যু ঘটে। আবার কোন কোন সময় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই হঠাৎ মৃত্যু ঘটে।

ফাউল পক্স ঃ

- মুরগরি বসন্ত রোগের জীবানু একপ্রকার ভাইরাস। সাধারনত ঃ মোরগ-মুরগি, কবুতর এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। যে কোন বয়সের মোরগ-মুরগিই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত মোরগ-মুরগি দ্বার এ রোগ খামারে ছড়িয়ে পড়ে। বাজার থেকে রোগাক্রান্ত মোরগ-মুরগি কিনে আনলেও এ রোগ খামারে ছড়াতে পারে। বসন্ত রোগে আক্রান্ত মোরগ-মুরগির লক্ষন ঃ
    - ➢ মোরগ-মুরগির পালক বিহীনস্থানে এ রোগের লক্ষন প্রকাশ পায়।
    - ➢ মাথার ঝুটি, লতি, মুখের কোনায়, চোখের পাতায় এবং মাঝে মাঝে পায়ে ছোট ছোট আঁচিলের মত গুটি দেখা যায় যা এ রোগ নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট।
    - ➢ গুটি হওয়ার আগে প্রথমে লাল হয় এবং রস জমা হয়। পরে কাল কাল গুটি তৈরী হয়।
    - ➢ এই রোগ হলে মোরগ-মুরগি খাওয়া থেকে বিরত থাকে।
    - ➢ মুরগির ডিম পাড়া কমে যায়।
    - ➢ এই রোগে বয়স্ক মোরগ-মুরগির মৃত্যুর হার কম। তবে বাচ্চা মোরগ-মুরগির মৃত্যুর হার তুলনামুলকভাবে বেশী হয়।
    - ➢ বড় মোরগ-মুরগি ৩-৪ সপ্তাহ রোগে ভোগার পর ভাল হয়ে যায়।

ফাউল কলেরা বা মুরগির কলেরা ঃ

- মুরগির কলেরা জীবানু এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া। এই জীবানু মুরগির দেহে প্রবেশ করে রক্তের সাথে মিশে এক প্রকার বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং রক্ত চলাচলের সাথে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত মোরগ-মুরগির মল দ্বারা এ রোগ খাদ্য ও পানিকে দূষিত করে এবং খামারে ছড়িয়ে পড়ে। বাজার থেকে রোগাক্রান্ত মোরগ-মুরগি কিনে আনলেও এ রোগ খামারে ছড়াতে পারে। সকল বয়সের মোরগ-মুরগির এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কলেরা রোগে আক্রান্ত মোরগ-মুরগির লক্ষন ঃ
    - ➢ এ রোগে আক্রান্ত মোরগ-মুরগি খেতে চায়না।
    - ➢ পালকগুলো খসখসে হয়ে যায়, চেহারায় অবসন্নতা আসে ও রক্তশূন্য মনে হয়ে ।
    - ➢ মোরগ-মুরগির পিপাসা বেড়ে যায়।

- পায়খানার রং সবুজ এবং সাদা ও ফেনাযুক্ত মনে হয়।
- চলাফেরা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।
- এক জায়গায় দাড়িয়ে ঝিমাতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়।

রক্ত আমাশয় বা ককসিডিওসিস ঃ

- মুরগির রক্ত আমাশয় বা ককসিডিওসিস এক প্রকার পরজীবি দ্বারা হয়ে থাকে। মোরগ-মুরগির অন্ত্রের মধ্যে এই রোগ বিস্তার লাভ করে এবং হজম করার শক্তি ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয় । এই রোগ মোরগ-মুরগির মলের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে। এই রোগের পরজীবি মুরগির অন্ত্রে প্রচুর ডিম দিয়ে থাকে। রোগাক্রান্ত মুরগির মল ভিজা মাটিতে পড়লে এ রোগের ডিম দীর্ঘ সময় জীবন্ত থাকে ও কোন রকমে অন্য কোন সুস্থ মুরগির পেটে খাবারের সাথে প্রবেশ করতে পারলে পুনঃ রোগ বিস্তার শুরু করে। বাজার থেকে রোগাক্রান্ত মোরগ-মুরগি কিনে আনলেও এ রোগ খামারে ছড়াতে পারে। সকল বয়সের মোরগ-মুরগির এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রক্ত আমাশয় বা ককসিডিওসিস রোগে আক্রান্ত মোরগ-মুরগির লক্ষণ ঃ
    - এ রোগে আক্রান্ত হলে মোরগ-মুরগি ঝিমাতে থাকে। চোখ বন্ধ করে রাখে ও গায়ের পালক ঝুলে পড়ে।
    - পায়খানার সাথে রক্ত মিশানো আম পড়তে থাকে।
    - খাদ্য হজম না হওয়ায় খাবার খেতে চায় না।
    - খাদ্য থলি পূর্ন থাকে।

ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস ঃ

- মুরগরির ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস রোগের জীবানু একপ্রকার ভাইরাস। এই রোগ সংক্রামক ও মারাত্মক ছোঁয়াচে প্রকৃতির । সাধারণত ঃ শ্বাস যন্ত্রই এই রোগে আক্রান্ত হয়। একটু বয়স্ক মোরগ-মুরগির এই রোগ দেখা দেয়। তবে সকল জাতের মোরগ-মুরগিরই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বছরের সব সময়ই এই রোগ হয়ে থাকে। ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস রোগে আক্রান্ত মোরগ-মুরগির লক্ষণ ঃ
    - এ রোগে আক্রান্ত হলে মোরগ-মুরগি ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নেয়।
    - কফ হাঁচি, নাক দিয়ে রক্ত মিশ্রিত শেষ্মা পড়ে।
    - হা করে নিশ্বাস নেয় এবং ঠোট দিয়ে পানি পড়ে।
    - রক্ত মিশ্রিত কফ ট্রাকিয়া ও ল্যারিংসের পথ বন্ধ করায় শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।
    - মাঝে মাঝে আক্রান্ত মোরগ-মুরগির প্রচন্ড জোরে মাথা ঝাকানোর সাথে সাথে গড় গড় বা ফিস ফিস শব্দ করতে দেখা যায়।

গামবোরো ঃ

- মুরগির গামবোরো রোগের জীবানু একপ্রকার ভাইরাস। গামবোরো রোগকে ইনফেকস্স বার্সাল ডিজিজও বলা হয়। সাধারণত ৩-৮ সপ্তাহ বয়সের মোরগ-মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বণিজ্যিক জাতের মোরগ-মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা দেয়। তবে সাধারণত দেশী মোরগ-মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায় না। গামবোরো রোগে আক্রান্ত মোরগ-মুরগির লক্ষণ ঃ
    - মুরগির অবসন্নতা হবে এবং পালক কুচকানো হবে।
    - মুরগির মলদার ময়লাযুক্ত হবে।
    - উচ্চ তাপমাত্রা, কাপুঁনি ও পানির মত ডায়রিয়া হবে।
    - খামারে প্রতিদিন অনেক মুরগি মারা যাবে এবং খামারের বেশীর ভাগ মোরগ-মুরগি মারা যাবে।

- রোগের প্রাদুর্ভাব কমে আসলে মৃত্যু বন্ধ হবে, তবে এদের থেকে আর আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যাবে না।

মুরগির রোগ প্রতিকার

মোরগ-মুরগির রোগ প্রতিরোধে প্রথমে আমাদেরকে রোগ বিস্তারের কারণ ও রোগ বিস্তার প্রক্রিয়া জানতে হবে। তা হলে মোরগ-মুরগির রোগ প্রতিকার করা সহজ হবে।

রোগ বিস্তারের কারণসমূহ ঃ

- মুরগির সুষম খাদ্যের অভাব।
- সীমাবদ্ধ স্থানে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত মুরগির অবস্থান।
- অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান বা পরিবেশে মুরগি পালন।
- খামারে রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবাণু, জীবাণু, পরজীবী, ছত্রাক, ইত্যাদির আবির্ভাব।
- খামারীদের মুরগির রোগজীবাণু বিষয়ে অসতর্কতা, অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা।
- মুরগিকে দুষিত ও ভেজা খাদ্য সরবরাহ করা।

রোগ বিস্তার প্রক্রিয়া ঃ

- অসুস্থ মুরগির মল,কফ, সর্দি, ক্ষত হতে বের হতে হওয়া রক্ত ও পূজঁ ইত্যাদির মাধ্যমে সূস্থদেহে রোগ বিস্তার লাভ করে।
- পানি ঃ কৃমির ডিম অসুস্থ মুরগির শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়া পালক, ময়লা বিভিন্ন প্রকার জীবানু দ্বারা দুষিত পানির মাধ্যমে রোগ বিস্তার লাভ করে।
- বাতাস ঃ দূষিত বাতাসের মাধ্যমে জীবানু ও শ্বাসযন্ত্রে রোগ জীবাণূ বিস্তার লাভ করে ।
- মাটি ঃ অনেক রোগ জীবানু ও কৃমির ডিম ভেজা মাটির মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে।
- পরিচর্যাকারী দূষিত মাটি মাড়িয়ে ঘরে ঢুকলে পায়ে পায়ে ঐ জীবাণূ মুরগির ঘরে বিস্তার লাভ করতে পারে।
- সংস্পর্শ ঃ রোগাক্রান্ত মুরগি পালকের সংস্পর্শে থেকেও রোগ জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।
- হ্যাচারিতে অসুস্থ মুরগির ডিম থেকেও এ সমস্ত রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে।
- বাহক ঃ অনেক সময় সুস্থ মুরগি নিজে অসুস্থ না হলেও রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।
- মানুষ বা অন্য কোন প্রানী, খামারের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি রোগের বাহক হিসাবে কাজ করতে পারে।
- এজন্য খামারে মুরগির চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা উত্তম।
- মনে রাখতে হবে অসুস্থ মুরগি একবার সংক্রামক রোগে অসুস্থ হলে চিকিৎসার পর সুস্থ হলে সেই মুরগি আর পূর্বের মত উৎপাদনশীল থাকে না।
- তাই মুরগির রোগ প্রতিকার এর জন্য টিকা প্রদান কর্মসূচী হচ্ছে একমাত্র উত্তম উপায়।
- তবে মুরগির রক্ত আমাশয় বা ককসিডিওসিস এবং ফাউল কলেরা বা মুরগির কলেরা রোগ প্রতিকারে স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হলে এ রোগের জন্য টিকা প্রদানের প্রয়োজন হয় না।
- ককসিডিওসিস রোগ দমনে প্রয়োজনে মুরগির খাদ্যের সাথে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত Cocidiostat ব্যবহার করতে হবে।
- তাছাড়া দেশী মুরগিকে নিম্নে বর্ণিত সকল প্রকার টিকা প্রদানের প্রয়োজন হয় না। তবে দেশী মুরগিকে অবশ্যই রাণীক্ষেত টিকা দিতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ফাউল পক্স এর টিকা দিতে হবে।

- গবাদি প্রাণির চিকিৎসা সেবা গ্রহনের জন্য যথাসময়ে ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থিত FIAC এ গিয়ে সিল (CEAL) এর সহায়তা অথবা উপজেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে গিয়ে Veterinary Doctor এর পরামর্শ নেয়ার জন্য খামারীদের উদ্বুদ্ধ করণ।

৪র্থ সেশন

বায়োসিকিউরিটি বা জীবনিরাপত্তা ও টিকা প্রদান কর্মসূচী সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

বায়োসিকিউরিটি বা জীবনিরাপত্তায় মৌলিক নীতি ঃ

- মুরগীকে একটি সুরক্ষিত পরিবেশে রাখতে হবে।
- খামারে নিয়মনীতির বাহিরে নতুন হাঁস-মুরগী ক্রয়/গ্রহণ করা যাবে না।
- অপরিচিত/বহিরাগতদের কোন অবস্থাতেই খামারে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।
- খামারে নিয়মিত জীবনিরাপত্তা শর্ত মেনে চলতে হবে।
- খামারের আশাপাশ, খামারের ঘর, প্রতিটি যন্ত্রপাতি এমনকি খামারে ব্যবহৃত সকল প্রকার যানবাহন নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

মুরগীর খামারে জীবনিরাপত্তার জন্য করণীয় ঃ

- মুরগী অসুস্থ হলে বুঝতে হবে খাঁচায় রোগ প্রবেশ করেছে, তাই সাথে সাথে আগে সুস্থ মুরগীকে দল থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে।
- খামার পরিচর্যায় প্রথমে সুস্থ ও পরে অসুস্থ মুরগীকে পরিচর্যা করতে হবে। তা না হলে অসুস্থ মুরগীর রোগ সুস্থ মুরগীতে ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে।
- অন্য খামার থেকে আগত বা বহিরাগত কাউকেই আপনার খামারে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না, কেননা উক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে আপনার খামারে রোগ ছড়ানোর ঝুকি থাকে।
- হাঁস-মুরগী ক্রয়-বিক্রয়কারী/মধ্যস্থতাকারী/ক্ষদ্র ব্যবসায়ী যারা হাঁস-মুরগী খামারে পণ্য সরবরাহ করেন, তাঁদেরকে ও তাঁদের সকল প্রকার যানবাহনকে খামার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে দেয় যাবে না।
- খামার পরিচর্যাকারীকে প্রতিবার খামারে প্রবেশের আগে ও পরে অবশ্যই দু'হাত সাবান ও পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
- খামার ব্যবস্থাপনায় একটি সেডের সকল মুরগী বের/বিক্রি না করা পর্যন্ত নতুন কোন মুরগী ঐ সেডে প্রবেশের নিয়ম নেই। তবে পারিবারিকভাবে মুরগী পালনে এ সুযোগ রয়েছে। তাই নতুন মুরগীকে কোন অবস্থাতেই ২ (দুই) সপ্তাহ পর্যন্ত পৃথকভাবে না পালন করে ও রোগ মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে বাড়ির মুরগীর দলের সাথে মিশতে দেয়া যাবে না,

বায়োসিকিউরিটি বা জীবনিরাপত্তা নিরাপত্তা ঃ

খামারকে রোগমুক্ত রাখতে এবং কাংখিত উৎপাদন পেতে বায়োসিকিউরিটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং এজন্য যা করতে হবে তা হচ্ছে-

- খামার অঙ্গন, প্রবেশ পথ ও খামারের চারপাশে মাঝেমধ্যেই জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে।
- ঘরের অভ্যন্তরে সর্বত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সরঞ্জামাদি জীবাণুনাশক দ্বারা জীবানু মুক্ত করতে হবে।
- খামারে সরবারহকৃত খাবার-পানি সর্বদা বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

- খামারে ব্যবহারের জন্য আলাদাভাবে পোষাক ও জুতার ব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারের মুরগির পরিচর্যার আগে দু'হাত ভালভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
- সকল মুরগীকে নিয়মিত ও সময়মত টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মৃত মুরগি গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়ে ফেলতে হবে।
- খামারে কবুতর বা অন্য কোন পোষা পাখি পালন করা যাবে না।
- ঘরে যাতে পাখি, ইঁদুর, কুকুর বা বন্য বিড়াল প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- দর্শণার্থীদের খামার পরিদর্শনে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- মুরগির বাচ্চা পালন শেষে প্রতি ব্যাচ এর সকল বাচ্চা বিক্রয় সম্পন্ন (All in-all out) করার পর ঐ সেড পরিস্কার করে কম পক্ষে ১৫ দিন পর নতুন করে বাচ্চা উঠানো যাবে।
- মুরগীর বাচ্চা বহনকারী খাঁচা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি পুনরায় ব্যবহারের পূর্বে ভালোভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে জীবাণুনাশক ঔষধ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
- মুরগীর ঘর ঝাড়ু দিয়ে মাচা ও মাচার নীচে, পাশের বেড়া ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে। তারপর পারিস্কার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে এবং সর্বশেষে জীবানুনাশক এর দ্রবন দ্বারা ঘরের মাচা, পাশের বেড়া ও খামারের আশেপাশে জীবানুমুক্ত করা হবে।
- ঘরে মুরগীর বাচ্চা উঠানোর ৩ দিন পূর্বে পুনরায় জীবানুমুক্তকরণ করতে হবে।

মুরগির টিকা প্রদান কর্মসূচী

(দেশী মুরগগিকে সাধারণত রাণীক্ষেত ও ফাউল পক্স ছাড়া অন্যান্য টিকা প্রদানের প্রয়োজন হয় না) ঃ

প্রতিষেধকের/টিকার নাম	যে বয়সে টিকা প্রদান করতে হবে	টিকার মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি
মারেক্স	১ দিন	চামড়ার নীচে ১ সিসি ইনজেকশণ প্রদান
গাম্বোরো	২ দিন	চোখে এক ফোঁটা প্রদান (প্যারেন্ট মুরগির টিকা প্রদান করা না থাকলে)
রাণীক্ষেত	৩-৫ দিন	এক ফোঁটা করে দুই চোখে প্রদান (প্যারেন্ট মুরগির টীকা প্রদান করা থাকলে ৭-১০ দিন বয়সে)
ইন্‌ফেকসাস ব্রংকাইটিস	৭ দিন	এক চোখে এক ফোঁটা প্রদান
গাম্বোরো	১০-১৪ দিন	এক চোখে এক ফোঁটা প্রদান
রাণীক্ষেত	২১-২৪ দিন	এক ফোঁটা করে দুই চোখে প্রদান
গাম্বোরো	২৪-২৮ দিন	এক চোখে এক ফোঁটা প্রদান
ফাউল পক্স	৩৫ দিন	চামড়ার নীচে সুচ ফুঁটিয়ে দেয়া
রাণীক্ষেত	৬০ দিন	চামড়ার নীচে/মাংসে এক সিসি ইনজেকশন প্রদান
ফাউল কলেরা	৮০-৮৫ দিন	চামড়ার নীচে/মাংসে এক সিসি ইনজেকশন প্রদান
ফাউল কলেরা	১১০-১১৫ দিন	চামড়ার নীচে/মাংসে এক সিসি ইনজেকশন প্রদান
ইন্‌ফেকসাস ব্রংকাইটিস	১৩০-১৩৫ দিন	চামড়ার নীচে/মাংসে এক সিসি ইনজেকশন প্রদান
কৃমির ঔষধ সেবন	১৩০-১৩৫ দিন	খাদ্য /পানির সাথে সেবন

৫ম সেশন

সিআইজি সদস্যদের কার্যক্রম; পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

সিআইজি এর কার্যক্রম ঃ

১. কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (CIG) হচ্ছে কিছু সংখ্যক কৃষক বা খামারীদের নিয়ে এমন একটি সংগঠন যাদের জীবিকা নির্বাহে মূখ্য কর্মকান্ড সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এদের অধিকাংশ সদস্য একই আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

২. এনএটিপি-২ প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি প্রাণিসম্পদ CIG গঠন করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি CIG-তে ৩০ জন কৃষক বা খামারী সদস্য রয়েছে। এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারী ৮০% এবং বড় ও মাঝারীসহ অনান্য খামারী ২০% এবং মোট সদস্যদের নারীর সংখ্যা ন্যূনতম ৩৫%।

৩. CIG কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি (Executive Committee-EC) গঠন থাকবে। তাঁরা মাসে কমপক্ষে একবার অথবা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়মিতভাবে CIG- এর সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেবেন। কমিটির মেয়াদ ২ বছর হবে।

৪. CIG নির্বাহী কমিটি গঠন সংক্রান্ত রেজুলেশন একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরবর্তীতে মাসিক ও বিশেষ সভার রেজুলেশনও উক্ত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে।

৫. CIG নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ হবে ঃ

সভাপতি	-	১ জন
সহ-সভাপতি	-	১ জন
সম্পাদক	-	১ জন
কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন
সদস্য	-	৫ জন

৬. নির্বাহী কমিটি CIG সদস্যদেরকে মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং স্থানীয় যে কোন একটি তফসিলি ব্যাংকে CIG এর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ জমা করবে। সে সঙ্গে সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় এর টাকা একটি পৃথক রেজিষ্টারে রেকর্ডভূক্তি করে হিসাব সংরক্ষণ করবে। CIG সদস্যগণ মাসিক সঞ্চয়ের হার বা পরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিবেন।

৭. নির্বাহী কমিটি CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ও মজুদ অর্থ ব্যবহারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন।

৮. নির্বাহী কমিটি সমবায় দপ্তরে CIG নিবন্ধন (CIG Registration) করে CIG-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের এর ব্যবস্থা নেবেন।

৯. ইউনিয়নের সকল সিআইজি সমন্বয়ে গঠিত ফেডারেশন অর্থাৎ প্রডিউসার্স অর্গানাইজেশন (PO) এর সাথে বাজার তথ্য সংগ্রহে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১০. নির্বাহী কমিটি প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে CIG সদস্যদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উহা সমাধানে প্রতি বৎসর প্রযুক্তি প্রদর্শনী গ্রহণ, গবাদি প্রাণি-হাঁস-মুরগীর কৃমিণাশক ও টিকা প্রদানের ক্যাম্পিং, ইত্যাদি বাস্তবায়নে সিআইজি মাইক্রোপ্লান প্রণয়ন ও তা উপজেলা সম্প্রসারণ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির নিমিত্তে Community Extension Agent for Livestock (CEAL) এর নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১১. উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে CIG সদস্যগণ প্রদর্শণী থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি নিজ নিজ খামারে ব্যবহার করবে এবং প্রত্যেক CIG সদস্য উক্ত প্রযুক্তি নিজ খামারের পার্শ্ববর্তী কমপক্ষে ৩(তিন) জন নন-সিআইজি কৃষক/খামারীকে গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করবেন।

১২. নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারকারী সিআইজি ও নন-সিআইজি সকল সদস্যদের নাম, ঠিকানা এবং উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে ও পরে উৎপাদনের রেকর্ড একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

১৩. উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ে নন-সিআইজি কৃষক/খামারীদেরকেও পরবর্তীতে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা

১. পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষতিকর কর্মকান্ড থেকে পরিবেশ ও সমাজকে রক্ষা করা, অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ এর সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের ফলে যাতে পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বিরূপ প্রভাব না ঘটে সে দিকে সচেতন থাকতে হবে।

২. তাই অত্র প্রকল্পে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে পরিবেশ ও সামাজিক বিরূপ প্রভাব হয় এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. প্রাণিসম্পদ সিআইজি মাইক্রোপ্ল্যান প্রণয়নের সময় যাতে জীব বৈচিত্র্য হারিয়ে না যায় বা পরিবেশ দূষণের ফলে প্রাণির স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা নিতে হবে। এ জন্য পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে সিআইজি ও সিল সদস্যদের-কে উদ্বুদ্ধ পূর্বক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. প্রণির দেহে বিভিন্ন পথে রোগে-জীবনু প্রবেশ করতে পারে, যেমন- মুখ, নাক, পায়ুপথ, দুধের বাট, চামড়ার ক্ষতস্থান, চোখ, ইত্যাদি। সাধারণত পরিবেশ সুরক্ষা না থাকলে এ সকল পথে রোগে-জীবনু সহজেই প্রবেশ করতে পারে। যেমন পরিবেশে বাতাস/পানি দুষিত থাকলে, রোগাক্রান্ত/মৃত প্রাণির যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে চলাচল/স্থানান্তর করা হলে, প্রাণির পরিচর্যাকারী কোন রোগাক্রান্ত প্রাণির সংস্পর্শে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিয়ে সুস্থ প্রাণির পরিচর্যা করলে, প্রাণিকে পঁচা/বাসি খাদ্য সরবরাহ করা হলে, হাট/বজারে অসুস্থ প্রাণি নিয়ে আসলে, ইত্যাদি। তাই পরিবেশ সুরক্ষায় এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. প্রাণির রোগ মুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মৃত প্রণি যত্রতত্র মাঠে ময়দানে বা ঝোপঝাড়ে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

৬. বাজার/অন্য কোনভাবে ক্রয়কৃত প্রাণিকে বাড়িতে/খামারে এনে সরাসরি অন্য প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে না। প্রয়োজন বোধে উক্ত প্রণিকে ৭-২১ দিন পর্যন্ত পৃথকভাবে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যদি নতুন প্রণির মধ্যে রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ না প্রায়, তখন বুঝতে হবে বাড়ির/খামারের অন্যান্য প্রাণির সাথে এই প্রণিকে একত্রে পালতে কোন সমস্যা নাই।

৭. প্রাণিকে সময়মত টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের খামারের প্রণিকে টিকা প্রদানের সাথে সাথে পার্শ্ববতী বাড়ি/খামারের প্রাণিকেও ঠিক একই প্রকারের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. পোলট্রির সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কল্পে জীবনিরাপত্তায় নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে ঃ

- অসুস্থ প্রাণিকে পৃথকী করণ।
- খামারে অভন্তরে বহিরাগতদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণকরণ।
- একটি সেডে একই বয়সের ব্রীড এর হাঁস/মুরগী পালন।
- স্বাস্থ্যবিধান (Sanitation) পদ্ধতি যথাযথভাবে পালন।

৯. প্রাণির বাসস্থান/খামার/আঙ্গিনা দৈনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

১০. প্রাণিকে প্রত্যহ পরিষ্কার পানি, টাটকা খাদ্য খাওয়াতে হবে।

১১. প্রাণির খাবার পাত্র ও পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন করতে হবে।

১২. আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় প্রাণিকে আর্সানিক মুক্ত পানি খাওয়ানোর বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

১৩. প্রণির উৎপাদিত পণ্য যেমন দুধ/মাংশ/ডিম এর গুণগত মান রক্ষায় সচেতন থাকতে হবে।

১৪. প্রাণির খাদ্য উপাদান ভেজালমুক্ত ও গুণগত মান হতে হবে।

১৫. প্রাণিকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

১৬. প্রাণির খামার স্থাপনে লোকালয়/মানুষের বাসস্থান থেকে একটু দূরে করতে হবে।

১৭. অতিরিক্ত শীত/গরম ও খড়া/বন্যা/প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় প্রাণি স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। এ সময়ে ঘাস চাষ কম হয় এবং প্রণির খাদ্য অপ্রতুল/দুষ্প্রাপ্য থাকে। অনেকে এ সময়ে প্রাণি বিক্রি করে পরবর্তীতে সামাজিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাই এ দিক বিবেচনায় রেখে অগাম প্রস্তুতি হিসাবে সময়পোযুগী দ্রুত বর্ধনশীল ঘাস চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৮. সম্প্রসারণ কার্যক্রমে মহিলা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বার্থ/সুবিধা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৯. পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজি সদস্যদের সভায় উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়মিত আলোচনা করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং পার্শ্ববর্তী নন-সিআইজি সদস্যদেরও বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে জানাতে হবে।

২০. পরিবেশে বায়ু দুষণ কমানোর জন্য প্রাণির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সিআইজি/সিল/এডপ্টারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিবেশ সুরক্ষায় খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা ঃ

১. গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি ইত্যাদির সরবরাহকৃত খাদ্যের ৫০-৬০% মল ও মূত্র হিসাবে বেরিয়ে আসে যা আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে নষ্ট বা অপচয় হওয়ার কারণে পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে।

২. খামার ব্যবস্থাপনায় গবাদিপ্রাণিকে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করায় রুমেন থেকে মিথেন উৎপাদন প্রায় ৩০% হ্রাস পায় ও পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩. প্রাণির রোগ মুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মৃত প্রাণির চামড়া ছাড়ানো যাবে না। মৃত পশু-পাখী যত্রতত্র মাঠে ময়দানে বা ঝোপঝাড়ে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

৪. প্রাণিকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।

৫. পরিবেশ সুরক্ষায় গোবর/বিষ্ঠা, মূত্র, প্রণি খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে ও সময়মত অপসারণ করলে পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। একাজে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করা যেতে পারে।

৬. গোবর/বিষ্ঠা থেকে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত করা হলে একদিকে পরিবেশে দূর্গন্ধ দুর হয় ও অন্যদিকে উৎপাদিত কম্পোষ্ট সার কৃষিতে ব্যবহার করায় কৃষির উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

৭. বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী উৎপাদন হওয়ায় দুষণমক্ত বায়ু ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নত মানের জৈব সার উৎপাদন হয়। তাই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সামাজিক নিরাপত্তায় অবদান রাখছে।

৮. বর্জ্য সঠিকভাবে কম্পোষ্ট করা হলে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস মারা যায় ও প্রাণির রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়।

কম্পোস্ট ও কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়া

১. কম্পোস্ট হচ্ছে পচাঁ জৈব উপকরণের এমন একটি মিশ্রণ যা উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে অনুজীব কর্তৃক প্রক্রিয়াজাত হয়ে উদ্ভিদের সরাসরি গ্রহন উপযোগী পুষ্টি উপকরণ সরবরাহ করে।

২. কম্পোষ্টিং হচ্ছে একটি নিয়ন্ত্রিত জৈবপচন প্রক্রিয়া, যা জৈব পদার্থকে স্থিতিশীল দ্রব্যে রূপান্তর করে।

৩. যে সকল অনুজীব পচনশীল পদার্থকে তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার কবে, সে সকল অনুজীবের উপর এ প্রক্রিয়া নির্ভরশীল।

৪. কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়ায় বর্জ্যের গন্ধ ও অন্যান্য বিরক্তিকর সমস্যা সম্বলিত পদার্থকে স্থিতিশীল গন্ধ ও রোগ জীবানু, মাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের প্রজননের অনপুযোগী পদার্থে রূপান্তরীত করে।

৫. মুরগির বিষ্টা ও আবর্জনার প্রকারভেদে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত হওয়ার সময় ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে কম্পোস্ট সার হিসাবে তখনই উপযুক্ত হবে যখন তার রং গাড় বাদামী হবে, তাপ কমে আসবে এবং একটা পঁচা গন্ধ বের হবে।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, সারা দিন প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ আলোচনা ও সমাপ্তিকরণ ঃ

- প্রশিক্ষণ সংগঠক প্রশিক্ষণ সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।
- তিনি প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে ২/৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে তাঁদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য আহ্বান জানাবেন।
- এ সময় প্রশিক্ষণার্থীগণ খোলামেলাভাবে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করবেন এবং প্রশিক্ষণ থেকে তাঁদের প্রাপ্ত জ্ঞান খামার পরিচালনায় বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোকপাত করবেন।
- পরিশেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক এক দিন প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ আলোচনা করবেন এবং সিআইজি সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ নিজ খামারে কাজে লাগিয়ে প্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।